শিশুর মেধা বিকাশে ইলাস্ট্রেশনের ভূমিকা

ভদ্রেশু রীটা*

সারসংক্ষেপ : শিশুরা চিত্রের মাধ্যমে অজানা বিষয়বস্তুকে চিনতে ও ধারণ করতে শেখে। একারণে শিশুকে কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে লিখিত বর্ণনার চাইতে রঙিন চিত্র বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে শিশুর জ্ঞান আহরণ তথা মেধা বিকাশে একটি অনন্য ও কার্যকর মাধ্যম হলো ইলাস্ট্রেশন। এর মাধ্যমে খুব দ্রুত শিশুর মনোজগতে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিরস্থায়ী ছাপ তৈরি হয়। ফলে বিষয়টি সে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সেই সঙ্গে গভীর আনন্দও লাভ করে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণ তাকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয় এবং সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ও মননশীল হিসেবে গড়ে তোলে। ইলাস্ট্রেশন শিশুর এই জ্ঞান লাভ তথা মেধা বিকাশে কীভাবে সহায়তা করে, বর্তমান আলোচনায় মূলত সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই কৌতূহলপ্রবণ। একটি শিশু জন্মের পর থেকে নানারকম কৌতূহল মেটানোর বাসনা নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে বড় হয়। যতই সে বড় হয়, তার অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। শিশু তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ বিষয়ে শিশুর দৃষ্টিশক্তির ভূমিকা সম্ভবত সবচেয়ে

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোন বস্তুর দিকে সে তাকায় তখন সেই বস্তুর আকার-রং-বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতির মাধ্যমে সে ধারণা অর্জন করে এবং বস্তুটি সম্পর্কে তার উপলব্ধি পূর্ণতা পায়। এভাবে স্বাভাবিক উপায়ে সে অনেক বস্তু চিনে নিতে শেখে। শিশুকে কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে লিখিত বর্ণনার চাইতে রঙিন চিত্র বেশি কার্যকর। কেননা, মানব-শিশুর সাধারণ ধর্ম হলো– একটি জিনিস সে আগে দেখে তারপর তার প্রতি জানতে আগ্রহী হয়। তাই শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শুধু লেখার ভাষা দিয়ে তার কৌতূহলদীপ্ত মনের ক্ষুধা মেটে না। একারণে অনেক ক্ষেত্রে জানার প্রতি তার অনাগ্রহ দেখা যায়। ফলে তার জানার ক্ষেত্রও অপূর্ণ থেকে যায়। ঠিক এখানেই রয়েছে ইলাস্ট্রেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এক্ষেত্রে শিশুর জ্ঞান আহরণে তথা মেধা বিকাশে একটি অনন্য ও কার্যকর মাধ্যম হলো ইলাস্ট্রেশন। কারণ, তথ্যের পাশাপাশি যদি তার দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক রঙিন দৃশ্যাবলি দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাতে দেখা ও জানা উভয়ই একসাথে হয়। এর ফলে জ্ঞাতব্য বিষয়টা সম্বন্ধে শিশু যেমন সম্যক ধারণা পায়, তেমনি তথ্যটা হৃদয়ঙ্গম করাও তাদের পক্ষে সহজ হয় ; যা তার মেধার পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বর্তমান আলোচনায় মূলত ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে তৈরি চিত্রভাষা শিশুর এই মেধা বিকাশে কীভাবে সহায়তা করে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইলাস্ট্রেশনের উদ্ভব ও বিকাশ

সহজ কথায় ইলাস্ট্রেশন হলো– কোনো কিছুকে উদ্ভাসিত করা। অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে কোনো কিছু প্রদর্শন করা ; ইংরেজিতে যাকে বলে 'illustrate'। ইংরেজি এই 'illustrate' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'illustrare' থেকে। এটি একটি ক্রিয়াপদ (verb), যার নামপদ (noun) হলো 'illustration'। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে আলোকপ্রভা (illumination), আধ্যাত্মিকতা (spiritual) এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানদান (intellectual enlightenment) ইত্যাদি বোঝাতে ইলাস্ট্রেশন শব্দটি ব্যবহৃত হতো।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন টেক্সট, গল্পকথন, কোনো বিষয় বা বস্তু, ঘটনা, ধারণা অথবা অনুভূতি ইত্যাদি দৃশ্যগতভাবে বর্ণনা করার একটি মাধ্যম হিসেবে 'ইলাস্ট্রেশন' শব্দটি সর্বাধিক পরিচিত। এক্ষেত্রে বর্ণনা শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি উল্লেখিত শব্দগুলির ক্ষেত্রে দৃশ্যগতভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি তার ব্যাখ্যান (exposition)-ও প্রদর্শন করে।

চিত্রের মাধ্যমে কোনো কিছুকে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা মানব ইতিহাসে নতুন কিছু নয় ; প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই তা প্রচলিত। বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত গুহাচিত্র থেকে প্রাপ্ত আদি চিত্রগুলিই এর প্রমাণ। মজার ব্যাপার হলো– শিল্পকলার যতগুলি ক্ষেত্র রয়েছে, তার প্রায় সবগুলির আদি নিদর্শন বিভিন্ন গুহার দেয়াল থেকেই পাওয়া গেছে। ইলাস্ট্রেশন যে অর্থে সর্বজনবিদিত তা শুরু হয় মূলত *illuminated manuscript*[১] নামে পরিচিত মধ্যযুগের ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি থেকে (সূত্র : Joshua, 2018)। ১৫ শতকের মাঝামাঝিতে মুদ্রণ পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৮ শতকের শেষের দিকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনায় এটি যুক্ত হতে থাকে। বিশেষ করে এসময়ে জনপ্রিয় লেখকদের বইতে ইলাস্ট্রেশনের ব্যবহার বইয়ের কাটতি বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ (সূত্র : Chris, 2016)|

উপরোক্ত বিবরণের সূত্র ধরে বলা যায়– আদি বাংলায় প্রথম ইলাস্ট্রেশন দেখা যায় পাল পুঁথিচিত্রে। তবে, এদেশে ইলাস্ট্রেশনের ইতিহাস শুরু হয় মূলত ব্রিটিশ শাসনামলে, মুদ্রণ যন্ত্র আবির্ভাবের পর। বিশেষ করে প্রযুক্তি-নির্ভর বিলেতি কায়দার মুদ্রণ শৈলীর ওপর ভিত্তি করেই এখানে ইলাস্ট্রেশনের প্রসার শুরু হয়। ১৭৭৮ সালে এদেশে বাংলা বই মুদ্রিত হলেও বইয়ের সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন মুদ্রিত হতে প্রায় চার দশক সময় লেগেছে। ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' বইতে বাংলার শিল্পীদের আঁকা প্রথম ইলাস্ট্রেশনের দেখা পাওয়া যায় (সূত্র : অশোক, ২০১৩)।

শিশুদের জ্ঞান ও মেধা বিকাশে ইলাস্ট্রেশনের ভূমিকা নিয়ে প্রথম গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হয় ১৮৮০ সালে। এর প্রধান উৎস হলো– শিশুর বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ নিয়ে রচিত Friedrich Dietrich Tiedemann- নামের জার্মান গবেষকের একটি ডায়েরি। এটি ১৮৯৫ সালে *Observation on the Development of Chidren's Visual Faculties* নামে বই আকারে প্রকাশিত হয় ; যা শিশু-মনস্তত্ত্ব গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই বিষয়ে গবেষণা চলতে থাকে এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইলাস্ট্রেশনযুক্ত বই প্রকাশিত হতে থাকে (সূত্র : Kümmerling-Meibauer, B. (Ed.), 2011)। এই গবেষণার প্রথম সফল ইলাস্ট্রেশনযুক্ত বইয়ের মধ্যে অন্যতম– *পাফিন বুকস*[২] (Puffin Books) সিরিজ। অপরদিকে *ঠাকুমা'র ঝুলি*[৩] নামে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত শিশুদের রূপকথার

বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমেই মূলত অবিভক্ত বাংলায় ইলাস্ট্রেশনের নিজস্ব শৈলী গড়ে ওঠে। অধিকাংশ গবেষকের মতে, বইটির সংকলক-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার নিজেই বইয়ের চিত্রগুলি এঁকেছেন। এই চিত্রগুলি থেকেই মূলত বাংলার রাক্ষস-খোক্ষস ও অন্যান্য রূপকথার চরিত্রগুলির দৃশ্যরূপ প্রথম তৈরি হয় (সূত্র : শাওন, ২০০৭)। যদিও বাংলার ইলাস্ট্রেশনের জগতে অনেক গুণী শিল্পীই জড়িত ছিলেন, কিন্তু শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আলাদা করে যাদের নাম না বললেই নয়, তাঁরা হলেন অসামান্য প্রতিভাধর তিন পুরুষ– উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায় এবং সত্যজিৎ রায়। এঁদের মধ্যে সুকুমার রায়-এর অনবদ্য সৃষ্টি 'আবোল-তাবোল' গ্রন্থের ড্রইংগুলি বাংলার শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশন জগতে ভিন্ন মাত্রার এক সংযোজন ; যা মৌলিকত্বের দিক থেকে অনন্য, অসাধারণ।

বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর অবধারিতভাবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও পটুয়া কামরুল হাসানের মাধ্যমেই এদেশের ইলাস্ট্রেশনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। তবে, শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশন চিত্রণে প্রথম কৃতিত্বের পরিচয় দেন কাজী আবুল কাসেম। তাঁর হাতেম তাই গ্রন্থের চিত্রগুলিতে– পরী, দানব, সাপ, পোশাক-পরিচ্ছদের সূক্ষ্ম অলংকরণ লক্ষ করা যায়। তাঁর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে– সরদার জয়েনউদ্দীনের 'অবাক অভিযান', আশরাফ সিদ্দিকীর 'বাণিজ্যেতে যাবো আমি' ইত্যাদি কবিতার ইলাস্ট্রেশন (সূত্র : শাওন, ২০০৭)। স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশনের জগতে বিশেষভাবে স্মরণীয় শিল্পী হাশেম খান ; যাঁর হাতে এদেশের অবহেলিত শিশুসাহিত্যের প্রকাশনা আকর্ষণীয় এবং গতিশীল হয়ে ওঠে। নিজস্ব শৈলীতে তিনি অজস্র বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রথম তিন দশকের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকের অলংকরণ শিল্পী হাশেম খানের অংকিত। বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বেশিরভাগ বইয়ের শিল্প সম্পদনায় রয়েছেন এই শিল্পী। সাম্প্রতিক সময়ে শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করছেন বেশ কিছু তরুণ শিল্পী। তাঁদের মধ্যে সব্যসাচী মিস্ত্রী, মামুন হোসাইন, বিপ্লব চক্রবর্ত্তী, মেহেদী হক, নাজমুল আলম মাসুম, চিন্ময় দেবর্ষী প্রমুখ শিল্পী উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে 'illuminated manuscript' নামে পরিচিত ধর্মীয় পাণ্ডুলিপিতে অংকিত ইলাস্ট্রেশন

পালযুগে পুঁথিতে অংকিত একটি ইলাস্ট্রেশন

রামচাঁদ রায় অংকিত 'অন্নদামঙ্গল' বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন

'পাফিন বুকস' সিরিজের একটি বইয়ের পৃষ্ঠার ইলাস্ট্রেশন

১৮ শতকে রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুসো' বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন

১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'ঠাকুমার ঝুলি' বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন

'আবোল তাবোল'-বইয়ে উপস্থাপিত শিল্পী সুকুমার রায় অংকিত 'ট্যাশ্ গরু' এবং 'খুড়োর কল' নামের দু'টি ছড়ার ইলাস্ট্রেশন

শিল্পী হাশেম খান অংকিত ইলাস্ট্রেশন

শিল্পী কাজী আবুল কাসেম অংকিত ইলাস্ট্রেশন

শিল্পী হাশেম খান অংকিত ইলাস্ট্রেশন

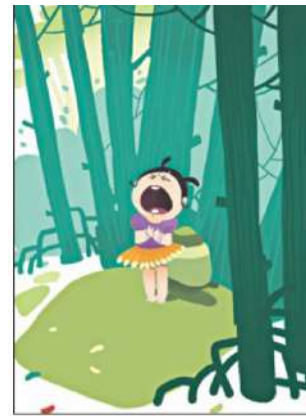

শিল্পী সব্যসাচী মিস্ত্রী অংকিত ইলাস্ট্রেশন

শিশুর সংজ্ঞাপন ও ইলাস্ট্রেশন

শিশুরা চারপাশের বিষয়বস্তুকে চিহ্নিত ও শনাক্তকরণের বোধশক্তি অর্জন করে তাদের সংবেদনশীল জ্ঞান-ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শিশুর সহজাত চিন্তাশক্তির প্রকাশ ঘটে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। এভাবে ক্রমশ তার শারীরিক ও মানসিক পরিপক্বতা অর্জিত হয়। তবে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে শিশুর বোধশক্তি, প্রজ্ঞা, ধারণ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারিত হয় কোনো বিষয় সে কতটুকু আয়ত্ত করতে পারছে এবং এই বিষয়ের সঙ্গে সে কতটুকু খাপ খাওয়াতে পারছে তার ওপর ভিত্তি করে (সূত্র : ভদ্রেশু, ২০১৭ : ৬৫)।

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক John Brainerd এবং শিশু মনোগবেষক Gavin Bremner-এর মত অনুযায়ী– শিশুর

স্বাভাবিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয় দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। একটি হলো সাদৃশ্যবিধান (Assimilation Capacity) এবং অন্যটি উপযোজন সামর্থ্য বা খাপ খাওয়ানো (Accommodation Capacity)। সাদৃশ্যবিধান (Assimilation) হলো– বিদ্যমান কোন চিন্তা / ধারণা / অনুভূতি / বিশ্বাস বা কল্পনার সঙ্গে নতুন কোন তথ্য সংযুক্ত করা। অন্যদিকে উপযোজন (Accommodation) হলো– পূর্বের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নতুন আয়ত্ত করা ধ্যান-ধারণার খাপ খাওয়ানো। অর্থাৎ পূর্বে দেখা কোনো বস্তুর সঙ্গে একই আকৃতির অন্য বস্তুর তুলনা করা এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হওয়া (সূত্র : Brainerd, 1996 ; Bremner, 2001)। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন : একটি শিশু যদি খেলার সামগ্রী 'বল' দেখে তবে বল আকৃতির সকল নতুন বস্তুই তার কাছে 'বল' হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এটি হলো সাদৃশ্যবিধান। আবার, শিশু যদি পূর্বে 'বল' দেখে থাকে তবে সে বল আকৃতির অন্য যেকোনো বস্তুকে বলের মতো মনে করে। কিন্তু বস্তুটি যে মূলত বল নয় তাও সে বুঝতে পারে। নির্দেশ করার সময়ে তাই সে উল্লেখ করে 'বলের মতো গোল'। অর্থাৎ সে হয়তো নতুন দেখা বস্তুটি কী জানে না কিন্তু আকৃতিটি বলের মতো সেটা উপলব্ধি করতে পারে। পরে যখন নতুন দেখা বস্তুটির সম্পর্কে জানতে পারে তখন সে তার আগের ধারণার সঙ্গে নতুন জানা তথ্যটির উপযোজন ঘটায় (সূত্র : ভদ্রেশু, ২০১৭ : ৬৬)। এটি হলো কোন কিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বা উপযোজন করা। এভাবে সাদৃশ্যবিধান এবং উপযোজনের মাধ্যমে শিশু তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কথা এবং বিশেষ করে ইমেজের সাহায্যে। অর্থাৎ শিশু দৃশ্যগত বস্তুর ছবি দেখে নাম বলতে ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে শেখে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমিকভাবে শিশুর জ্ঞান আহরণের পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে ছবি বা চিত্র প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এ বিবেচনায় শিশুর পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে প্রাথমিক অভ্যস্ততা তৈরির জন্য বইতে ছবি বা চিত্র উপস্থাপন করা জরুরি বলে মনে করা হয়। কারণ, বইতে হরেক রকম তথ্য থাকলেও শিশুদের অস্পষ্টতা অনেক সময়েই যথার্থরূপে দূর হয় না। যার দরুন অনেক ক্ষেত্রে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি তাদের বোঝার বাইরে থেকে যায়। এমতাবস্থায় প্রয়োজন হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি বা চিত্রের উপস্থাপনা। এসমস্ত চিত্র থেকে খুব দ্রুত শিশুর মনোজগতে নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তু সম্পর্কে চিরস্থায়ী একটি ছাপ তৈরি হয়। শিশু যখন

বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পড়ে, তখন স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বস্তু দেখতে কেমন তা জানার কৌতূহল প্রকাশ করে। তখন তথ্য বা কাহিনির পাশে যদি উক্ত বিষয় বা বস্তুর দৃশ্যগত বর্ণনা তথা ইলাস্ট্রেশন দেখতে পায়, তখন সে বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সেই সাথে গভীর আনন্দও লাভ করে। এই আনন্দ তাকে পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলে ; যা তাকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয় এবং সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ও মননশীল করে গড়ে তোলে। এ বিষয়ে কানাডার উইনিপেগ বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক এবং শিশু-সাহিত্যিক Perry Nodelman (1996)-এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> '... because they find them easier to understand than words and need pictorial information to guide their response to verbal information.' (Nodelman, 1996 : 216)

আরও নির্দিষ্ট করে বললে ইলাস্ট্রেশন–

● বইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে শিশুকে একটি পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি দেয়। এটি তাৎক্ষণিক তথ্য সরবারহ করতে সাহায্য করে এবং প্রায়শই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ যোগ বা হাস্যরস তৈরি করে শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট করে ; যা হয়তো মূল লেখায় অন্তর্ভুক্ত নেই।

● পড়তে সক্ষম হওয়ার পূর্বেই শিশুর বইয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে সাহায্য করে। বইয়ের রচিত সকল টেক্সট বুঝতে পারুক বা না পারুক উজ্জ্বল রং এবং পরিচিত-অপরিচিত নানান অভিব্যক্তির চরিত্র ও তাদের অভিনব উপস্থাপনের কারণে নির্দিষ্ট সময় অব্দি শিশু বইয়ের প্রতি মনোযোগী থাকে।

● প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে শিশুর কথোপকথনের সুযোগ তৈরি করে। অর্থাৎ শিশু চিত্র সম্পর্কে নানান ধরনের প্রশ্ন করে। 'এটা কি?', 'এটার রং এমন কেন?', 'ও কাঁদছে কেন?', 'ওরা কী খাচ্ছে?' ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং যথাযথ উত্তর শোনার মধ্য দিয়ে শিশু বইয়ের মাঝে ব্যস্ত থাকে ; যা তার ভাষার দক্ষতা এবং নতুন নতুন শব্দ শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

● শিশুদের সৃজনশীল চেতনা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ শিশুর সুকুমার বৃত্তি তথা ইতিবাচক সৃষ্টিশীল মানস গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে।

● বিভিন্ন রচিত বিষয়-বস্তু চিনতে ও তাদের নিয়ে শিশুদের ভাবতে শেখায়। ফলে তাদের একটি কল্পনার রাজ্য তৈরি হয়। পড়তে পড়তে সেখানে তারা বিচরণ করে এবং সর্বোপরি তাদের মানসলোকে বিষয়বস্তুটি ধারণ করতে পারে। সহজ কথায় চিত্রের মাধ্যমে শিশু বুঝতে পারে গল্প বা ছড়ার চরিত্রগুলি দেখতে কেমন। যেমন : গল্পের কে রাক্ষস আর কে রাজকন্যা ; কে দুষ্টু লোক আর কে ই বা রাজপুত্র, চারপাশের আবহ ইত্যাদি। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিশুর এমন এক অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়, যেখানে ক্ষেত্র বিশেষে শিশু নিজেই গল্পের একজন চরিত্র হয়ে যায়। এর ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি তৈরি হয়।

● বইয়ের টেক্সট সম্পর্কে দৃশ্যগত ধারণা দেয়ার পাশাপাশি পড়ার কৌশল আয়ত্তকরণেও শিশুকে সাহায্য করে। কী পড়ছে, কীভাবে ভাবলে তা অর্থপূর্ণ হবে– তা শেখার জন্য উপস্থাপিত চিত্রগুলি শিশুর জন্য এক ধরনের মডেলস্বরূপ। এর ফলে শিশু যখন স্বাধীনভাবে পড়তে শেখে, তখন সে নিজের পড়ার বোধগম্যতা বাড়ানোর জন্য অনুরূপ কৌশল ব্যবহার করতে পারে।

● বইয়ের সঙ্গে শিশুদের একধরনের আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে শিশু বই বোঝার দক্ষতা অর্জন করে। বিশেষ করে চিত্রিত ছবির মাধ্যমেই শিশু বই ধরার সঠিক ভঙ্গি বুঝতে পারে। এছাড়া বইয়ের কোনটা প্রথম পৃষ্ঠা, কোনটা শেষ পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার উপর-নিচ দিক সম্পর্কে শিশুর প্রাথমিক জ্ঞান তৈরি হয়।

বিভিন্ন ধরনের ইলাস্ট্রেশন ও শিশুদের মেধা বিকাশে এর ভূমিকা

বইয়ের ইলাস্ট্রেশন শিশুদের ক্ষেত্রে তথ্যের নিরব অথচ প্রধান একটি উৎস। এটি শিশুদের অনুমানভিত্তিক বোধগম্যতা শানিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শেখা বা আনন্দ যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে শিশুদের পড়াশোনার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা-বোঝা। এই জানা ও বোঝার সময়ে রচিত লেখার সঙ্গে শিশু তার মানসিক কল্পমূর্তি তৈরি করতে চায়। তার এই চাহিদা পূরণ করে ইলাস্ট্রেশন। তাই বয়স-উপযোগী শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইলাস্ট্রেশন তৈরি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দর্শনে এগুলির মাধ্যমে শিশুদের

মনোযোগ আকৃষ্ট করাই এর মূল উদ্দেশ্য। একারণে শিশুদের ইলাস্ট্রেশনযুক্ত বইতে (বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশন) টেক্সটের তুলনায় ইলাস্ট্রেশনগুলিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। যেহেতু ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিশুরা ইতিহাস-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিষয়েও প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে থাকে, তাই এক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেশনেরও বিচিত্র ধরন দেখা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে একই কৌশল অবলম্বনে এসমস্ত ইলাস্ট্রেশন অংকিত হয় তা নয়, বরং রংয়ে-রেখায়-ছন্দে থাকে ভিন্নতা। কোথাও কলমের আঁচড়ে মূর্ত হয় ঝাপসা হয়ে যাওয়া পুরনো দিনের হাতিয়ার ; কোথাও তুলির ছোঁয়ায় প্রাণ পায় হারিয়ে যাওয়া আদিবাসীর ঘর-বাড়ি ; কোথাও ফটোগ্রাফির আলো-আঁধারিতে হেসে ওঠে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি ; আবার কোথাও বা জলরংয়ের ওয়াশে জীবন্ত হয়ে ফিরে আসে আদিম মানুষের ধূসর কাহিনী। ধরন যাই হোক না কেন, রং দিয়ে শিশুরা যেমন প্রথম প্রকৃতিকে চিনতে শেখে, তেমনি বইয়ের পাতার ইলাস্ট্রেশন দিয়ে সে তার চেনা-জানার পরিসরকে বর্ধিত করে।

শিশুদের ইলাস্ট্রেশন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রধান তিন ধরনের ইলাস্ট্রেশন নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

কার্টুনধর্মী ইলাস্ট্রেশন : এ ধরনের ইলাস্ট্রেশনে বিষয়বস্তুর প্রকৃত গড়নকে বিকৃত (distorted) না করে কিছুটা মজাদার, হাস্যরসাত্মক আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়। এগুলি সহজ, সরল প্রাথমিক ফর্মে আঁকা ইলাস্ট্রেশন ; যা সাধারণত আলো-ছায়াবিহীন উজ্জ্বল ফ্ল্যাট রং-এ অঙ্কিত হয়ে থাকে। রং, রেখা বা গড়নে এই ধরনের ইলাস্ট্রেশনের সঙ্গে বিষয়বস্তুর বাস্তবিক ত্রিমাত্রিকতা বা পরিপ্রেক্ষিতের তেমন কোনো সাদৃশ্য থাকে না। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিতও হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে নির্দিষ্ট বস্তুর চরিত্র নিরূপণে শিশুর কোনো সমস্যা হয় না। কারণ বাস্তবধর্মী না হলেও এগুলি বাস্তব আদলকে ভিত্তি করে সরলভাবে আঁকা হয়। ফলে চেনা চরিত্রের অসাধারণ উপস্থাপনের ছবির মাধ্যমে শিশু আকৃষ্ট হয়। সাধারণত শিশুতোষ ছড়া, কবিতা, গল্প, কমিকস্ ইত্যাদির ইলাস্ট্রেশনে কার্টুনধর্মী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কিছু ইলাস্ট্রেশন উপস্থাপন করা হলো–

চিত্র নং-১

কার্টুনধর্মী ইলাস্ট্রেশনের কিছু নমুনা

চিত্র নং-২

চিত্র নং-৩

উপস্থাপিত ছড়া ও গল্পের ইলাস্ট্রেশনগুলি (চিত্র নং-১, ২, ৩) কার্টুনধর্মী হলেও এখানে তিন ধরনের শৈলী বিদ্যমান। প্রতিটি চিত্রের ক্ষেত্রে ফিগারের দেহের গড়ন, চেহারা, চুলের ধরন ইত্যাদিতে ভিন্নতা রয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে (চিত্র নং-১) ফিগারের অঙ্গসৌষ্ঠবে সরলীকরণ থাকলেও তাতে হাত-পা'য়ের ভাঁজ, চুল বাঁধার ভঙ্গি, পাখির ড্রইং, কাশফুলের ঝোপ ও ঘাসে তুলির টানের স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। ফলে পুরো চিত্রে একধরনের গতিময়তা প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে (চিত্র নং-২) উপস্থাপিত শিশুদ্বয়ের চেহারা এবং দেহের ড্রইং একই মাত্রার স্ট্রোকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ফলে এদের গোটা অঙ্গে পুতুল সদৃশ এক ধরনের কাঠিন্য থাকলেও উজ্জ্বল উষ্ণ রং ফিগার দু'টিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তৃতীয় চিত্রে (চিত্র নং-৩) ফিগারগুলির শরীরের তুলনায় ছোট পা, সরু গলাযুক্ত ব্যতিক্রমী বড় মাথা, হাস্যরসযুক্ত অভিব্যক্তি ইত্যাদিতে রয়েছে লাইনের ছন্দময় উপস্থাপন। ফলে ফিগারগুলিতে এক ধরনের নমনীয় ভাব তৈরি হয়েছে।

এধরনের কার্টুনধর্মী ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে শিশু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যেমন : ১. চিত্রিত উপাদান থেকে রেখা, বিন্দু, রং ইত্যাদি শনাক্তকরণ। ২. ত্রিমাত্রিক বস্তুর দ্বিমাত্রিক ফর্মে উপস্থাপন সম্পর্কে জ্ঞান। ৩. দৃশ্যগত উদাহরণ শেখার বোধশক্তি অর্জন ইত্যাদি (সূত্র : DeLoache, Strauss & Maynard, 1979 : 77-89 ; Nodelman, 1988: 35)। বাস্তব বিষয়বস্তুর দৃশ্যগত ফর্ম তৈরির জন্য শিশুর এই উপলব্ধি বিশেষভাবে প্রয়োজন। কেননা, দৃশ্যগত এ ধরনের ফর্ম তৈরির মাধ্যমে একদিকে যেমন বস্তু এবং দৃশ্যচিহ্ন সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান অর্জন সহজ হয়, অন্যদিকে দৃশ্যগত ভাষা (visual grammer)-র নিয়মাবলী আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।

প্রতিটি ইলাস্ট্রেশন থেকে শিশু যে একই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে তা নয়। ইলাস্ট্রেশন থেকে কোন বিষয়টি শিশুর সংজ্ঞাপন তৈরিতে সাহায্য করবে, তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে শিশুর গ্রহণ করা জ্ঞানের পরিধির ওপর। এক্ষেত্রে শিশুর বয়স কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যেমন : উল্লেখিত ইলাস্ট্রেশনগুলির ক্ষেত্রে বলা যায়– শিশু প্রথম চিত্র (চিত্র নং-১) থেকে কাশফুল সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কেননা, ধরে নেয়া যায় এখানে উপস্থাপিত উড়ন্ত পাখি, মেয়ে শিশু, ঘাসের ড্রইং শিশুর পরিচিত। কিন্তু যেহেতু অবস্থানগত কারণে কাশফুল সচরাচর দেখা যায় না তাই এটি তার কাছে নতুন কোনো বস্তু। প্রথম দর্শনে সে হয়তো তার পরিচিত ঘর পরিষ্কার করার ঝাড়ুর সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে যখন শিশু এর প্রকৃত পরিচয়টি জানতে পারবে, তখন সে চেনা ঝাড়ুর সঙ্গে এর উপযোজন ঘটাবে। অর্থাৎ ঝাড়ুর মতো দেখতে হলেও তা একটি ফুল তা সে জানতে পারবে। এভাবে কাশফুল সম্পর্কে শিশুর একটি ধারণা তৈরি হবে এবং তার জ্ঞান ভাণ্ডারে নতুন একটি অনুষঙ্গ যুক্ত হবে। আবার দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র নং-২) উপস্থাপিত সকল উপাদানই হয়তো শিশুর পরিচিত। কিন্তু তার চেনা বস্তুর এমন উজ্জ্বল রংয়ের সাথে সে হয়তো অপরিচিত। ফলে তার মনে রং সম্পর্কে এক ধরনের কৌতূহল তৈরি হবে। এর থেকে সে রংয়ের বিভিন্ন ধরন এবং উপাদান বিষয়ে শিশুর জানার ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং তার আঁকার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে তৃতীয় চিত্রে (চিত্র নং-৩) প্রদর্শিত প্রতিটি উপাদানই হয়তো শিশুর পরিচিত। কিন্তু চিত্রিত ফিগারের অভিব্যক্তি এবং দেহভঙ্গিমা হয়তো তার অচেনা। ফলে এখান থেকে সে নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের অভিব্যক্তি (expression) ও দেহভঙ্গিমার (body language) নির্দিষ্ট ভাষা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশন : সাধারণত শিশুদের বইয়ের ইলাস্ট্রেশন অতি মাত্রায় বাস্তবধর্মী হতে দেখা যায় না। বাস্তবধর্মী বলতে এখানে বোঝানো হয় বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশ বাস্তবসম্মতভাবে সমানুপাতিক। অর্থাৎ বস্তু বা প্রাণীর বাস্তব গড়ন অনুযায়ী যথাসম্ভব বিশদভাবে উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেশনগুলি হয় সরল কিন্তু বিস্তারিত। ক্ষেত্র বিশেষে এগুলিতে আলো-ছায়ার ব্যবহার থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু রং ব্যবহারে প্রকৃতির প্রচলিত রংকেই সাধারণত প্রাধান্য দেয়া হয়। শিশুতোষ ফিকশন বই ছাড়াও শিক্ষামূলক বিভিন্ন নন-ফিকশন বইয়ের ইলাস্ট্রেশনে বাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কারণ, এ ধরনের ইলাস্ট্রেশন নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বর্ণনা ও আবহকে এমনভাবে অঙ্কন করে থাকে, যা জটিল শিক্ষামূলক বিষয়কেও শিশুদের কাছে শক্তিশালীভাবে প্রাণবন্ত ও বোধগম্য করে তোলে।

চিত্র নং-৪

চিত্র নং-৫

চিত্র নং-৬

বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশনের কিছু নমুনা

এখানে তিনটি ইলাস্ট্রেশন (চিত্র নং-৪, ৫, ৬) উপস্থাপন করা হয়েছে, যা তিন ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে বাস্তবধর্মী রূপে আঁকা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটিরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আমেজ। প্রথমটি একটি গল্পের ইলাস্ট্রেশন (চিত্র নং-৪) ; যেখানে প্রতিটি

উপাদানে নিজস্ব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান। গাছের টেক্সচার থেকে শুরু করে ফিগারের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পোশাকের ভাঁজ, বিড়ালের শরীরের ক্ষুদ্র লোম পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ড্রইংয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপস্থাপন এবং রং নির্বাচন এগুলিকে নিজ রূপের আদলে মূর্ত করেছে অত্যন্ত সফলভাবে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে যথাযথ আলো-ছায়ার ব্যবহার ; যাতে তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক ত্রিমাত্রিকতা। ফলে প্রতিটি চরিত্র এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়টি শিশুতোষ ছড়ার একটি ইলাস্ট্রেশন (চিত্র নং-৫)। এক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদানে পর্যাপ্ত আলো-ছায়ার ব্যবহার না থাকার দরুন এখানে স্বাভাবিক মাত্রা তেমন পাওয়া যায় না। তবে, ড্রইংয়ের সূক্ষ্মতা এবং ছন্দময়তা প্রতিটি আলাদা বিষয়বস্তুকে নিজস্ব চরিত্রে দৃশ্যায়িত করেছে। এর সঙ্গে উজ্জ্বল রংয়ের ব্যবহার চিত্রটিকে এক ধরনের আনন্দময় এবং প্রাণবন্তময় অনুভূতির জন্ম দেয়। তৃতীয় চিত্রটি (চিত্র নং-৬) পরিবেশের ওপর রচিত একটি লেখার ইলাস্ট্রেশন। এখানে লাইনের সূক্ষ্মতার পাশাপাশি রংয়ের তারতম্য এবং আলো-ছায়ার ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। একারণে হরিণ এবং গাছগুলিতে একধরনের ডাইমেনশন তৈরি হয়েছে। অপরদিকে দূরের গাছ, হরিণের পাল এবং কাছের গাছ ইত্যাদি পরস্পরের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে উপস্থাপিত হয়েছে। এই দূরত্ব শুধু যে ড্রইংয়ে তা নয়, বরং রংয়েও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ পুরো চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা দেয়া হয়েছে। ফলে চিত্রটিতে একটি বিস্তৃর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রতীয়মান হয় ; যা লিখিত বিষয়বস্তুর একটি দৃশ্যগত বাস্তব রূপ।

এধরনের বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশন পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিশুর দৃষ্টিশক্তিকে পরিস্ফূট করে। অপরদিকে বাস্তবাকৃতি পরিচিত চিত্র এবং টেক্সটের অধিক সংখ্যক অজানা শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে শিশুর বোধগম্যতা বাড়িয়ে তোলে। যেহেতু এ ধরনের ইলাস্ট্রেশন টেক্সটের বিবরণকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে, সেহেতু অজনা তথ্য খুব দ্রুত শিশুর মস্তিস্কে জায়গা করে নেয়। এভাবে বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিশুর জানার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার বোধও তীক্ষ্ণ হতে থাকে। ফলে শিশু সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে খাপ খাওয়ানোর বোধ, সম্পর্ক ও চেতনা অনুধাবন করতে শেখে।

এক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশন একটি টেক্সটের বিশদ বর্ণনার পুরোটাই দৃশ্যায়িত করে, তা নয়। তবে, এ ধরনের ইলাস্ট্রেশনগুলিতে অতিরিক্ত অনেক তথ্য থাকে, যা শিশুকে টেক্সটের পুরো আবহ বুঝতে সাহায্য করে। যেমন : উপযুক্ত

ইলাস্ট্রেশনের (চিত্র নং-৪) ক্ষেত্রে ধরা যাক গল্পে বিড়াল আর শিশু দু'টি কী করছে, কেন করছে সে বিষয়ে হয়তো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলা নেই। সেক্ষেত্রে আকাশের মেঘ, পড়ে থাকা গাছের চিত্র থেকে শিশু গল্পের আবহ সম্পর্কে একটি ধারণা পাবে, যা অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তার মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হবে। আবার, চিত্রিত মানুষের ফিগার দু'টি এবং বিড়ালগুলি হয়তো শিশুর পরিচিত। কিন্তু এখানে দু'টি ফিগারের পোশাক দুই রকম এবং শিশুর কাছে হয়তো তার একটি অপরিচিত। এক্ষেত্রে শিশু অতিরিক্ত তথ্য পাবে এই চিত্র থেকে, যা হয়তো গল্পে উল্লেখ নেই। এভাবে শিশু গল্প থেকে যেমন নতুন শব্দ জানতে পারে, তেমনি ইলাস্ট্রেশন থেকেও নতুন তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রের (চিত্র নং-৫) ক্ষেত্রেও শিশু বাড়তি অনেক তথ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। এটি চার লাইনের একটি ছড়ার ইলাস্ট্রেশন ; যেখানে মা আর মেয়ে থাকলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানে রচিত খুকুমনির ঘরের আঙ্গিনার পুরো পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে খুকু আর তার মায়ের পাশাপাশি শিশু অতিরিক্ত তথ্য জানতে পারবে, যেমন : খুকুর বাড়িতে পাখি আছে, বিড়াল আছে, ফুলের বাগান আছে ইত্যাদি। এই অধিক সংযোজিত চিত্রের সঙ্গে শিশু তার পরিচিত বাড়ির সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করবে। ফলে বাড়ির পরিবেশ সম্পর্কে তার জ্ঞাত ধারণার পাশে স্থান করে নেবে অচেনা সকল অংশ। তৃতীয় চিত্রের (চিত্র নং-৬) ক্ষেত্রে হয়তো বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো বনের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এখানে সেই বর্ণনার দৃশ্যগত অংশের পাশাপাশি না বলা কিছু বাড়তি দৃশ্য শিশু অবলোকন করতে পারবে, যেমন : বিভিন্ন ধরনের গাছের উচ্চতা ও বৈশিষ্ট্য, গাছ ও পানির পাশাপাশি অবস্থান, নির্দিষ্ট প্রাণির দল বেঁধে বিচরণ, তাদের পানি খাওয়ার ধরন ইত্যাদি। এর ফলে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর ধারণা আরও স্বচ্ছ হবে এবং এই সম্পর্কে তার চেতনবোধও বৃদ্ধি পাবে।

শৈলীপ্রধান ইলাস্ট্রেশন : এধরনের ইলাস্ট্রেশনে বিষয়বস্তু মূলত শিল্পীর নিজস্ব শৈলীতে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। একারণে এগুলি বাস্তবধর্মী বা কার্টুনধর্মী যেভাবেই চিত্রিত হোক না কেন, তাতে বৈচিত্র্যময় রূপ দেখা যায় অধিক মাত্রায়। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর আকৃতির ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অস্বাভাবিক অথচ মজাদার নানান আকৃতিতে উপস্থাপিত হতে পারে। তাই তো চারপেয়ে পরিচিত চরিত্র যখন সেজেগুজে রঙিন শার্ট গায়ে দিয়ে দু'পায়ে চলতে থাকে, বা পাখি চোখে কাজল মেখে মালা পরে গান গায়, মেঘের অবাক দৃষ্টিযুক্ত চোখ তৈরি হয়, অথবা মানব অবয়বের চেনা গড়ন অসাধারণ হয়ে ওঠে, তখন

শিশুর মনে ছবির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়, বাড়িয়ে তোলে তার কৌতূহল। রং ব্যবহারেও এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ইচ্ছেমতো যেমন খুশি তেমন রং ব্যবহৃত হতে পারে। তাই সাদা মেঘ হতে পারে রঙিন, অথবা সবুজ গাছ হতে পারে সাদা। এক্ষেত্রে প্রায়শই বিষয়বস্তুতে বা ব্যাকগ্রাউন্ডে লোকজ নকশা, টাইপোগ্রাফি অথবা ডিজাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ক্ষেত্র বিশেষে শিশুতোষ বিভিন্ন ফিকশন বইয়ে এই ধরনের ইলাস্ট্রেশন উপস্থাপিত হতে পারে। ব্যতিক্রমী রং, গড়ন ও টেক্সচারের কারণে এই ধরনের ইলাস্ট্রেশন চট্ করে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাই শিশু চিত্রিত ছবির দৃশ্যগত ভাষা বোঝার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে চিত্র বিষয়ে লেখা টেক্সট পড়া এবং প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তারা উৎসাহী হয়। এভাবে ক্রমশ শিশুর শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং পড়ার প্রতি তার আগ্রহ বাড়ে। উপরন্তু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে শিশুর জ্ঞান পিপাসাও বিস্তৃত হয়।

চিত্র নং-৭

চিত্র নং-৮

চিত্র নং-৯

শৈলীপ্রধান ইলাস্ট্রেশনের কিছু নমুনা

এখানে শৈলীপ্রধান কয়েকটি ইলাস্ট্রেশন (চিত্র নং-৭, ৮, ৯) উপস্থাপিত হয়েছে, যা নির্দিষ্ট কিছু গল্পের দৃশ্যগত রূপ। প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে (চিত্র নং-৭) দেখা যায়–

একটি শিশুর ঘরের পাখাযুক্ত জানালার আকাশে উড়ে যাওয়ার দৃশ্য। এখানে প্লেন আকৃতির রঙিন পাখি, নানান রংয়ের মেঘের মধ্যে প্যাঁচানো ফর্ম, সমুদ্রের সর্পিলাকার ভিন্ন ধরনের ঢেউ, গোলাপী পানিতে হরেক রকম মাছের চলাফেরা– সবই যেন শিশু মনকে কল্পলোকের এক ঠিকানার সন্ধান দেয়। দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র নং-৮) দুই ধরনের শৈলীর সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এখানে রমণীর সঙ্গে আলিঙ্গনরত শিশুর ফিগার দু'টি কার্টুন বৈশিষ্ট্যের। কিন্তু রমণী নিজে দৃশ্যায়িত হয়েছে ব্যতিক্রমী ঢঙের বেশ-ভূষণে। যদিও শাড়ি পরিহিতা নারীটি প্রোফাইলভাবে কুণ্ডলায়িত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট, তথাপি তার শাড়ির কুচিগুলি সামনের দিকে ফেরানো ; যেন তা শাড়ি আর ঘাগড়ার সংমিশ্রণ। আবার অন্যভাবে দেখলে কিছুটা যেন কিউবিজম ধারার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আবার নারীর মুখমণ্ডল সহজ সরল এক স্ট্রোকে আঁকা, কিন্তু চুলগুলি নিখুঁত লাইনে সুললিত কুণ্ডলীতে পরম যত্নে সাজানো। তৃতীয় চিত্রে (চিত্র নং-৯) উপস্থাপিত উপকরণে বাংলার দেশজ চিহ্ন স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান। এখানে দুইপাশের গাছগুলি চিত্রায়িত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠার নকশার আদলে। ফিগারটিও বাংলার লোকজ ফর্মের আদলে অঙ্কিত। আবার পানি, পদ্ম ফুল, পাতাতে রয়েছে স্বাভাবিক দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ। ইলাস্ট্রেশনটি দেশজ ও স্বাভাবিক উপকরণে সজ্জিত ভিন্ন মাত্রার একটি উপস্থাপন, যা শিশুমনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়ার জন্য যথেষ্ট উপযোগী।

এ ধরনের শৈলীপ্রধান ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে চেনা বিষয়বস্তুর অস্বাভাবিক উপস্থাপন শিশুর কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে চিত্রের নানান শৈলী সম্পর্কে শিশুর ধারণা জন্মায় এবং নিজ সংস্কৃতিকে চেনার প্রয়াস পায়। সেই সঙ্গে তারা রূপক বা উপমার ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে শেখে। পাশাপাশি বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি হয় : যার দরুন পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর স্বতন্ত্র মতাদর্শ তৈরি হয়। এছাড়া এ ধরনের ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে শিশু প্রাথমিকভাবে বিষয় বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করে এবং পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে তাদের মনে বিকল্প পদ্ধতি শেখার উপায় সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়।

এই ধরনের চিত্র থেকে শিশু প্রচুর নতুন নতুন বিষয় এবং তার ভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। যেমন : উপরে বিবৃত প্রথম ইলাস্ট্রেশনে (চিত্র নং-৭) চিত্রিত পরিচিত ঘরের জানালার উদ্ভূত পাখনা শিশুমনে তার চেনা ও জানার গণ্ডিকে ভিন্ন

এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার সুযোগ করে দেবে। বাস্তবে জানালার যে পাখা থাকে না সে বিষয়টি শিশু হয়তো জানে। ফলে এখানে পাখার উপস্থাপন এবং মেঘ, পাখি, পানির অচেনা শৈলী তার চিন্তার পরিধি বাড়িয়ে দেবে : এ থেকে শিশুর চারপাশের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের থেকে ভিন্নভাবে দেখার চোখ তৈরি হবে। আবার দ্বিতীয় ইলাস্ট্রেশনে (চিত্র নং-৮) টেক্সটে উল্লিখিত মায়ের রূপকে দেখানো হয়েছে অনেক বড়, ব্যতিক্রমী ভঙ্গিতে। যেহেতু শিশুর জন্ম থেকেই মা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাই 'মা'কে হয়তো আলাদা করে শিশুরা তেমন ভাবে না। 'মা' তাই সবসময় তাদের কাছে ভালোবাসার, আদরের ব্যতীত অন্য কিছু হয়তো হয়ে ওঠে না। এখানে 'মা'-এর ভিন্ন মাত্রার উপস্থাপন শিশুর মনে 'মা'কে অন্য এক রূপে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে। শিশুর মনে মায়ের প্রতি যে আসন, অবস্থান, মর্যাদা– এগুলোর ভাবগত জ্ঞান তৈরিতে সাহায্য করবে। তৃতীয় ইলাস্ট্রেশনে (চিত্র নং-৯) নকশি পিঠার আদলে গাছের চিত্র বিভিন্ন বিষয়ে রূপকের ব্যবহার সম্পর্কে শিশুর ধারণা তৈরি করবে। অপরদিকে ফিগারের তুলনায় বড়ো ফুল, পাতা এবং ঝিনুকের চিত্র থেকে শিশু বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পরস্পরের সঙ্গে তুলনা এবং ভিন্ন আঙ্গিকের বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করবে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে–ইলাস্ট্রেশন পারিপার্শ্বিক বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে শিশুর অন্তর্দৃষ্টি সক্রিয় করার কার্যকর একটি মাধ্যম। শিশুর চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশে এটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে। তাই শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাদের গঠনমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত করা অত্যন্ত জরুরি; যেখানে ইলাস্ট্রেশনের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশে অধিকাংশ অভিভাবক শিশুর পুথিগত পড়াশোনা নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, তার সুষ্ঠু বিকাশ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ঠিক ততটাই উদাসীন। এদেশের বিদ্যালয়গুলোতেও প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা যেরকম গঠনমূলক হওয়া উচিত, তেমনটা দেখা যায় না। তবে অল্প কয়েকটি বিদ্যালয়ও রয়েছে, যেখানে শিশুদের মনস্তত্ত্ব বুঝে তাদের পাঠক্রম তৈরি হয় এবং সেই অনুযায়ী শিশুরা গঠনমূলক নানা কার্যক্রমের পাশাপাশি আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। সেখানে প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন পাঠের সঙ্গে শিশুদের ছবি আঁকা বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। এ ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে চট্টগ্রামে অবস্থিত ফুলকি, ঢাকায় অবস্থিত অরণি, নালন্দা, সহজ পাঠ ইত্যাদি বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। যাই হোক, তথাকথিত সফল মানুষ হওয়া নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় এবং ঘরে প্রাণপণ লড়াইয়ের মাঝে শিশুদের স্বস্তি দান এবং মানবিক

বিকাশে প্রয়োজন ইলাস্ট্রেশনযুক্ত শিশুতোষ বিভিন্ন ধরনের বই। কিন্তু প্রতিবছর এখানে বইমেলায় শত শত শিশুতোষ বই থাকলেও ভালো বিষয়বস্তু ও আকর্ষণীয় ইলাস্ট্রেশনের অভাবে এগুলোর বেশিরভাগই উপযোগিতাসম্পন্ন হয় না। এর কারণ হয়তো বাংলাদেশে শিশুতোষ বইয়ের টেক্সটকে দৃশ্যগতভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ইলাস্ট্রেশন শিল্পীর অভাব। তার মানে এই নয় যে, শিল্পীরা এ ব্যাপারে অনাগ্রহী, বরং এক্ষেত্রে শিল্পীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করার রেওয়াজ রয়েছে বাংলাদেশে। ফলে অনেক যোগ্য শিল্পী এ পেশায় আসার ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। এ সত্ত্বেও পূর্বে উল্লিখিত কিছু সংখ্যক তরুণ শিল্পী এদেশের শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশনকে একটি মান সম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

উপসংহার

কোমলমতি শিশুরা নতুন প্রজন্মের ধারক ও বাহক। তাই তার পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন গুণগত দিক নির্দেশনা। শিশুরা চিত্রের মাধ্যমে অজানা বিষয়বস্তুকে চিনতে শেখে, ধারণ করতে শেখে এবং সত্যিকার অর্থে চিত্র ব্যতীত কোনো কিছুর প্রতি সহজে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং তাদের এই প্রবণতাকে ব্যবহার করে শিশুর মেধা বিকাশের পর্বগুলোতে ইতিবাচক বহুমুখী শিক্ষাচর্চা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেশন প্রধান সহায়ক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এ বিষয়ে যদিও ইউনিসেফ কর্তৃক নানান ধরনের কার্যকলাপ শিশু এবং তরুণদের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে অবদান রাখছে, কিন্তু শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সচেতনতাই এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে সফলভাবে।

টীকা

১. **Illuminated Manuscript :** এগুলো সোনা অথবা রুপার গুঁড়া মেশানো রং দিয়ে অংকিত অলংকরণযুক্ত হাতে-লেখা ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি। এই ধরনের রং ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বইগুলোকে আলোকপ্রভার একটা অনুভূতি প্রদর্শন করা। এগুলা তৈরি হতো ধর্মীয় মঠের 'Scriptoria' নামের এক ধরনের অতি পবিত্র কক্ষে। এই পাণ্ডুলিপিতে বিষয়বস্তু রচনার শুরুর অক্ষরটি অন্য লেখার তুলনায় অনেক বড় এবং নকশা দিয়ে আবৃত করা হতো। মূলত অলংকরণগুলি করা হতো লেখার চারপাশে। মাঝে মাঝে লেখার মাঝে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন

ইলাস্ট্রেশন সংযুক্ত হতো। তৎকালীন ধর্মীয় বিভিন্ন বই সংরক্ষণ এবং তার কপি করা পবিত্রতা রক্ষা করার প্রথম শর্ত হিসেবে এই পাণ্ডুলিপিগুলো তৈরি করা হতো (সূত্র : Encyclopedia Britannica)।

২. **পাফিন বুকস (Puffin Books) :** শিশুদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চিত্রসমৃদ্ধ প্রাথমিক ধারণামূলক বইয়ের সিরিজ। ইংরেজ বুক ডিজাইনার, সম্পাদক এবং প্রকাশক নোয়েল ক্যারিংটনের চিন্তার ফসল হিসেবে এই বইয়ের প্রথম চারটি খণ্ড ১৯৪০ সালে প্রকাশক অ্যালেন লেনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ২৫ বছরে মোট ১২০টি বই প্রকাশিত হয়। এই সিরিজ দিয়েই যাত্রা শুরু হয় পেঙ্গুইন-এর ছোটোদের প্রকাশনা 'পাফিন পিকচার বুকস'-এর। বইগুলোর মূল কাগজের একপিঠ ছাপা হতো রঙিন, অন্য পিঠ সাদা-কালো রঙে (আশিস, ২০১৫ ; সূত্র : ভদ্রেশু, ২০১৭ : ৭৮)।

৩. **ঠাকুমা'র ঝুলি :** বাংলার লোকমুখে প্রচলিত রূপকথা। লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা মানুষের মুখে শুনে শুনে ও গ্রামবাংলায় ঘুরে ঘুরে এসব লোককাহিনি সংগ্রহ করেন। এমনকি বৃদ্ধাদের ফোকলা দাঁতের জন্য জড়িয়ে যাওয়া কথাকেও তিনি ফনোগ্রাফের সাহায্যে মোমের রেকর্ডে রেখাবদ্ধ করে নিতেন। তারপর সেই রেকর্ড বারবার বাজিয়ে তা থেকে সঠিক কাহিনি বুঝে নিয়ে নিজস্ব লেখন-রীতি অনুসারে সাহিত্য রূপ দেন। ১৯০৭ সালে তিনি লোকগীতিকা সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেনের সাহায্যে সেকালের কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশক ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স থেকে এগুলোকে 'ঠাকুমা'র ঝুলি নামে বই আকারে প্রকাশ করেন। 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'ডালিম কুমার', 'নীলকমল আর লালকমল' উক্ত বইয়ের কিছু নমুনা গল্প (বিশ্বজিৎ, ২০০৭ ; সূত্র : ভদ্রেশু, ২০১৭ : ৭৯)।

তথ্যসূত্র

অশোক উপাধ্যায় (২০১৩)। 'অন্নদামঙ্গল'। ১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, চার্বাক, পৃ. ২০৯। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

আশিস পাঠক (২০১৫)। পাফিন পিকচার বুক। ১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,

চার্বাক, পৃ. ১০৯-১১৩। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক) (২০০৭)। ঠাকুরমা'র ঝুলি, (শতবার্ষিক সংস্করণ)। অবসর প্রকাশনী, ঢাকা।

শাওন আকন্দ, সম্পা. লালা রুখ সেলিম (২০০৭)। গ্রাফিক ডিজাইন : গ্রন্থ-নকশা, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ। চারু ও কারুকলা। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ভদ্রেশু রীটা (২০১৭)। "শিশুর সংজ্ঞাপন-দক্ষতা অর্জনে চিত্রসমৃদ্ধ শিশুতোষ গ্রন্থের ভূমিকা"। ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা। বর্ষ ৯, সংখ্যা ১৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Brainerd, C. J. (1996). "Piaget: A centernnial celebration". Psychological Science, 7, 191-225

Bremner, J. G. (2001). Cognitive development: Knowledge of the physical world. In J.

G. Bremner & A. Fogel (Eds.), Blackwell handbook of infant development (pp. 99-138). Malden, MA: Blackwell.

Chris Russell (2016). “A Brief History of Book Illustration”. Lhttps://lithub.com/a-brief-history-of-book-illustration/

DeLoache, J. S., Strauss, M. S., & Maynard, J. (1979). Picture perception in infancy. Infant Behavior and Development, 2, 77-89.

Joshua J. Mark (2018). “Illuminated Manuscripts”. Ancient History Encyclopedia.

Kümmerling-Meibauer, B. (Ed.). (2011). Emergent literacy: children’s books from 0 to 3 (Vol. 13). John Benjamins Publishing.